পঞ্চম অধ্যায়

আখ্যান ও চরিত্র নির্মাণের স্বাতন্ত্র্য ঃ সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা

আখ্যান বলতে বোঝায় কাহিনির নির্মাণ ও বিনির্মাণ, ঘটনাবিন্যাসের ক্রম রক্ষা করে আবার সেই ক্রমের রৈখিকতা ভেঙে দেওয়া। কাহিনি সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ ধারণা এখন পরিবর্তিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্যান ধারণা চিন্তাশক্তিরও বিনির্মাণ হতে থাকে। মানবজীবনে জটিলতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে তত তাঁর চেতনার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটছে। ফলে উপন্যাসে প্রতিফলিত হচ্ছে বহুমাত্রিক জীবনের নানা অভিঘাত। বিশিষ্ট সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য যাকে বলেছেন—

> জগৎ ও জীবনের রূপান্তর প্রবণ উপলব্ধির উপযুক্ত আধারের নিরন্তর খোঁজ।[১]

এই আধারের নিরন্তর খোঁজেই আজকের লেখক এবং পাঠক সত্তা বিনির্মিত হয়ে চলেছে।

সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় ধারা হল উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাসের সব পাঠক সমান নন। এক শ্রেণির পাঠক আছেন যারা কাহিনির মায়ায় বুঁদ হয়ে রস আস্বাদন করেন কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে কোনো তাৎপর্যের সন্ধান করেন না। আর এক শ্রেণির পাঠক আছেন যাদের কাছে কাহিনি মুখ্য নয়। তারা জানেন উপন্যাস হল বহুস্বরিক প্রক্রিয়া যার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে অনেক অর্থ এবং বার্তা, যা গড়ে ওঠে সময় ও পরিসরের দ্বিবাচনিকতায়। সাম্প্রতিক পাঠক তাই কাহিনির আকর্ষণে উপন্যাস পাঠ করেন না। গল্পের বিন্যাসে তিনি অনুসন্ধান করেন তাৎপর্যের নব্য গ্রন্থনা।

> যেদিন থেকে মানুষ সত্তা ও চিন্তার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে, কল্পনা দিয়ে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের পরিপূরক বা প্রতিস্পর্ধী নব্য বাস্তব রচনা করতে শিখেছে — সেদিন থেকে তার অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে দ্যোতনাময়। দৈনন্দিন জীবনের অন্তরালে অন্য আরেক পরাজীবন আবিষ্কার করতে শিখেছে মানুষ। তাই কাহিনি কেবল গল্প মায়ার অলস বিস্তার নয়, তাতে প্রচ্ছন্ন থাকে ব্যক্তিগত ও যৌথ স্মৃতির গ্রন্থণা, আস্তিত্বিক অভিজ্ঞানের উপস্থাপনা। ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও সামূহিক অভিজ্ঞানের দ্বিরালাপে অঞ্চল-গোষ্ঠী-জাতি-লিঙ্গ-বর্গগত পরিচয় নিহিত থাকে বলে কল্পনা-নির্মিত প্রতিবেদনে সময় ও পরিসরের বহুমাত্রিক সত্য ব্যক্ত হয়।[২]

উপন্যাস মানে শুধু কাহিনির গ্রন্থণা নয়। আসলে কাহিনি হল বাইরের আকরণ বা কাঠামো যাকে ভেদ করে কৌতূহলী পাঠক চিহ্নতত্ত্বের সাহায্যে অন্তর্বস্তুর নির্যাস আহরণ করেন। উপন্যাসের নির্যাস পাঠকের মনে যে

প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তোলে তাতেই সার্থকতা লাভ করে উপন্যাস। আখ্যান সম্পর্কে তাত্ত্বিকদের ভাবনা পাঠক এবং লেখকদের সামনে এক নতুন দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পাঠক প্রতিক্রিয়াবাদ, নারীচেতনাবাদ, মনোবিকলনবাদ, আকরনোত্তরবাদ, নিম্নবর্গীয়চেতনাবাদ প্রভৃতি তত্ত্ব আখ্যানভাবনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

> কাহিনি সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দিয়ে বয়নবিশ্বের নব্য পরিসরগুলিকে শনাক্ত করা শক্ত। এই জন্য ইদানীং বলা হচ্ছে আখ্যানতত্ত্বের কথা, আখ্যান ও শৈলীর প্রায় — অন্তহীন অন্তর্বয়নের প্রসঙ্গ তাতে চিত্তাকর্ষক ভাবে বিশ্লেষিত হচ্ছে।[৩]

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্য আলোচনায় আখ্যানতত্ত্ব গুরুত্ব পাচ্ছে। নতুন প্রতিবেদনের তাৎপর্যানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ পুনঃপাঠের মাধ্যমে বিগত সময়ের উপন্যাসেরও মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

বিশ শতকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ চিরাচরিত, কাহিনি সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে এসে সৃষ্টি করেছিলেন 'চোখের বালি' (১৯০৩) এবং 'চতুরঙ্গ'-র (১৯১৬) মতো উপন্যাস। ১৯২৯ এ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কথাবস্তুর চেয়ে লিখন শৈলীর প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক সমালোচকই এদের 'কবির উপন্যাস' বলে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন। কিন্তু কাহিনির নির্মাণে এই নতুনত্ব এক নতুন দিক নির্ণয় করেছিল।

> ... তাঁর সৃজনী কল্পনাকে অনেকখানি উস্‌কে দিয়েছিল উনিশ শতকের অন্তিম পর্যায়ে ও বিশ শতকের সূচনা পর্যায়ে ইউরোপের নবায়মান বৌদ্ধিক অসহ। আর কাহিনির ভাবনা প্রেক্ষিতের শরিক হয়েও কীভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম সৃজনী সংরাগের প্রমাণ দেওয়া যায় — অন্য বাচনিক মাধ্যমের মতো উপন্যাসেও — তা হাতে কলমে দেখিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং এতে প্রথম এই শিল্পিত সত্য উদ্‌ভাসিত হল যে, সময়ও পরিসরের বহুমাত্রিক দ্বিরালাপে নিষ্পন্ন এই লিখন — প্রকল্পে ক্রমাগত কাহিনির মেদ আর গল্পের মায়া ঝরিয়ে ঝরিয়ে এগিয়ে যাবে একের পরে এক লেখক-প্রজন্ম।[৪]

বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই শুরু হয়েছিল উপন্যাসের মনোরম কাহিনি পরিবেশনের ধারা। তাঁর উত্তরসূরিরাও তাঁর ধারাকেই অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার শরৎচন্দ্রের মধ্যে গল্পকথকের আদিছায়া লক্ষ করা গেলেও সমকালীন সমাজের সমস্যাবলী তাঁর লেখায় গুরুত্ব পেয়েছে। তবে তাঁর রচনায়ও কাহিনির প্রাধান্য শৈলীর তুলনায় বেশি ছিল।

> লক্ষণীয়ভাবে এঁরা নির্ভর করেছেন পরিমিত লিখন-শেলীর ওপরে। তাই সার্বিক বিচারে শৈলীর রূপান্তর তেমনভাবে ঘটেনি। বিষয়বস্তু ও শৈলীর দ্বিবাচনিকতা কতদূর বিস্তৃত হতে পারে, তা তেমন করে বঙ্গীয় কাহিনিকারেরা পরখ করে দেখলেনই না। তাঁদের সামর্থ্য ছিল কিন্তু আত্মবিনির্মাণের ইচ্ছা তত জোরালো ছিল না।[৫]

কাহিনির মায়া কাটিয়ে লিখন-শৈলীতে রূপান্তর নিয়ে আসার কথা তখন বাংলা সাহিত্যে গুরুত্ব পায়নি।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) রচনা এযুগের পাঠকৃতিতে পুনঃপাঠের দ্বারা নতুন করে মূল্যায়িত হচ্ছে। কিন্তু একসময় ত্রৈলোক্যনাথকে বয়স্ক পাঠ্য রূপকথার লেখক বলে তাচ্ছিল্য করা হত।

> ত্রৈলোক্যনাথের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি লিখন-প্রকরণ থেকে 'নভেলি মিথ্যা ছায়াকে' মুছে নেননি শুধু, খাঁটি বিকল্প সন্ধান করেছিলেন। তিনি যে নতুন সৃষ্টির পথ তৈরি করতে চাইলেন, এর কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে উপনিবেশের মনন-জাত ঔপন্যাসিক সন্দর্ভে নিষ্পেষিত জনসমাজে কণ্ঠস্বর ও বিকল্প প্রতিবেদনের সমান্তরালতা ব্যক্ত হওয়ার সমস্ত পথই রুদ্ধ থাকবে। তাই আখ্যান সংগঠনের প্রতীচ্যায়িত ধারার প্রতিস্পর্ধী স্রোত গড়ে তুলতে হল তাঁকে।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাস লেখার রীতিতে যে অভিনবত্ব নিয়ে এসেছিলেন পাঠকবর্গকে তা আকর্ষণ করেছিল।

> ...বাংলায় এই আঙ্গিকের বই আগে লেখা হয়নি, যেখানে লেখক সরে গিয়ে মুখ্য পাত্রপাত্রীদের মনের কথা বলতে দিয়েছেন, সেই পথে গল্পও এগিয়েছে।[৭]

'রজনী'র পূর্বে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্দিরা' উপন্যাসে আত্মকথনমূলক আঙ্গিকের যে ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন তার মধ্যে খুব ক্ষীণ হলেও একটা অভিনবত্ব লক্ষ করা গিয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্কিম প্রভাব পর্বের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করলেও তাঁর রচনায় একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। সমসাময়িক সমাজের নানা সমস্যা তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। নারীর অবস্থান সম্পর্কে ভাবিত স্বর্ণকুমারীকে তাঁর উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্নেহলতা বা পালিতা' দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯২ ও ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে।

> নারীর কথান্যাস হিসেবে এর মধ্যে যত অপূর্ণতাই থাক, বাঙালি সমাজে দীপায়ন প্রসূত আধুনিকতা ক্রমশ যেসব সমস্যা তৈরি করেছিল, তার ইঙ্গিত বয়নে ধূপছায়ার আবহ সঞ্চারিত করে দিয়েছে।[৮]

উনিশ শতকের শেষে একজন মহিলা লেখিকার রচনায় এই মনন ও চিন্তাধারা যে আধুনিকতার সূচনা করেছিল তা বিস্ময় সৃষ্টি করে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'কাহাকে?' তে তিনি কাহিনির গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে বৈচিত্র্য নিয়ে এলেন উপন্যাসে

> কাহাকে উপন্যাসটি নায়িকার জবানবন্দিতে রচিত, এর আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' ও 'ইন্দিরা'-য় উত্তমপুরুষের রীতিতে অর্থাৎ আত্মকথন-রীতিতে উপন্যাসের কাহিনি বয়ন করেছিলেন। সুতরাং এদিক দিয়ে উপন্যাসের এই style কোনও অভিনব style নয়। কিন্তু তাই বলে, 'কাহাকে' ও 'ইন্দিরা'র রীতিপদ্ধতি সম্পূর্ণত এক ও নয়। বঙ্কিম উপন্যাসের ঘটনবহুলতা স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসটিতে নেই। তাছাড়া 'ইন্দিরা'-তে যেখানে নায়িকা লঘুচপল ভঙ্গিতে — প্রতিবেশকে রঙ্গমুখর করেছে, সেখানে 'কাহাকে'-র আদি অন্ত serious ও গম্ভীর। আবার, 'রজনী' বিভিন্ন চরিত্রের

> জবানবন্দির সমবায়ে গঠিত, 'কাহাকে'-তে একজন নারীই আগাগোড়া বলে গিয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে যেখানে লেখক সর্বজ্ঞ, চরিত্ররা তাদের হৃদয়ানুভূতি নিজমুখে ব্যক্ত করেনি, বড়জোর সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে মাত্র সেখানে 'রজনী' কিংবা 'ইন্দিরা'-তে চরিত্ররা স্বকীয় অন্তরের অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে পেরেছে নতুন এই রীতির জন্য। কিন্তু তাহলেও, ঘটনার পর ঘটনার সংযোজনের ফলে স্বভাবতই চরিত্ররা নিজের মনের কথা তেমন ভাবে প্রকাশ করার অবসর পায়নি। 'কাহাকে' উপন্যাসের নায়িকা আত্মমগ্ন, উপন্যাসের শিকড় তাই - বাইরের জগতে নয়, অন্তরের জগতে।[৯]

উপন্যাসটিতে নায়িকা মণি বা মৃণালিনী উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ অব্দি নিজ ভাবনা প্রকাশ করেছে এবং সেই ভাবনাই কাহিনির জাল তৈরি করেছে। ফলে, উপন্যাসটি কাহিনি প্রধান না হয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অভিমুখী হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই রীতির ব্যবহার একেবারেই নতুন। সে সময়কার অনেক ঔপন্যাসিকরাই উপন্যাসে গানের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'কাহাকে?'-তে শুরু থেকে উপন্যাসের আদ্যন্ত একটি মাত্র গানের অসামান্য প্রভাব দেখা যায় নায়িকা মৃণালিনীর জীবনে এবং পরিণতিতে এই গানটিই হয়ে উঠেছে কাহিনির নিয়ামকসূত্র।

> মনোরাজ্যের জটিল রহস্যময়তা প্রার্থিত চরিত্রে এনেও, একটি সাঙ্গীতিক পরিমন্ডল উপন্যাসের মাস মজ্জায় ছড়িয়ে রেখে অভিনবত্বের সঞ্চার করেছেন। যে পরিশীলিত মনোলোক ও সঙ্গীতের সূক্ষ্ম তন্তজালে জীবনকে সমাচ্ছাদিত দেখেছেন, তাঁর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ ও মনোজয়িতার আধার 'কাহাকে' উপন্যাসের আদ্যোপান্ত তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।[১০]

প্রায় দেড়শো বছর আগে লেখা উপন্যাসে এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর লিখন-শৈলীর নতুনত্ব সৃষ্টি করে গেছেন লেখিকা যে উপন্যাসটি পাঠ করা, আস্বাদন করা এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলাম। সত্তরের দশকের শেষে একজন দক্ষিণ ভারতীয় সমালোচক এদেশে ইংরেজি লিখনের উন্মেষ সম্পর্কে আলোচনায় স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে?'-র ইংরেজি অনুবাদ An unfinished song-র (১৯১৩) উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন।

> বিষয়বস্তু উপস্থাপনা ও শৈলীর অভিনবত্ব এবং মুন্সিয়ানায় বিশেষত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তাঁর সুচিন্তিত মতে 'মিসেস ঘোষাল' পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত ভার্জিনিয়া উলফের সুযোগ্য ভারতীয় অগ্রগামিনী।[১১]

বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যে 'ত্রয়ী' উপন্যাস রচনা করলেন। বিচিত্রা (১৯২০, স্বপ্নবাণী ১৯২১, মিলনরাত্রি ১৯২৫) উপন্যাস রচনা করে নতুনত্ব সৃষ্টি করলেন। এই উপন্যাসে কথাগ্রন্থনার ক্ষেত্রে কোনো অভিনবত্ব না থাকলেও চিরাচরিত কাহিনি রচনার ধারা থেকে বেরিয়ে এসে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে যে সময়টা নারী স্বাধীনতার প্রত্যুষপর্ব রূপে চিহ্নিত। সে সময়কার সাহিত্যেও অন্যতম বিষয় ছিল নারীর নূতন মূল্যায়ন। তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক সহ মোট এগারোটি উপন্যাসে কালানুক্রমিক ইতিহাসের মধ্যে স্বর্ণকুমারী নারীকে কীভাবে দেখছেন সেটাই এখানে আলোচনা করা হবে। যে কয়েকটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে তাঁর নারীভাবনার বিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে সেগুলোকেই আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণ' রচিত হয়েছিল দিল্লির হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের মাধ্যমে 'আর্য' শক্তির পতন ও মুসলমান রাজশক্তির উত্থানের কাহিনি দিয়ে। এই স্বদেশচেতনা ঊনবিংশ শতাব্দীর পরাধীনতার উপলব্ধি থেকেই জাগ্রত। বাংলার নারী আন্দোলনের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী যুক্ত ছিলেন। তিনি চাইতেন যে দেশের নারীসমাজও দেশমাতার শৃঙ্খলমুক্তির জন্য এগিয়ে আসুক। সেজন্যই উপন্যাসে পৃথ্বীরাজ মহিষী, রাজকন্যা ঊষাবতী, চাঁদ কবির স্ত্রী প্রভাবতী, তার সখি শৈলবালা এই সব মহিমান্বিত আর্য নারীদের প্রতিবিম্ব তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রভাবতী সখি শৈলবালাকে নিয়ে পুরুষের বেশে স্বামীর খোঁজে আজমীর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা কৃপাণধারী অশ্বারোহী। ঋক্‌বেদে আছে যে বিশ্‌পলা স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মেয়েদের অশ্বারোহণ স্বর্ণকুমারীর সময়কালে ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে ছিল। তবুও বাঙালি পাঠকের কাছে লেখিকাকে ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে —

> স্ত্রীলোকের অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতেছেন শুনিয়া ভরসা করি কেহ আশ্চর্য্য হইবেন না। কেননা আমরা ত বাঙালি স্ত্রীলোকের কথা বলিতেছি না। পশ্চিম মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এখনও স্ত্রীলোকদিগকে সময়ে সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে যাইতে দেখা যায়, তখনকার দিনে হিন্দুস্থানী রমণীর - বিশেষতঃ রাজপুত-ললনার অশ্বারোহণ — নিপুণতা - প্রসিদ্ধ কথা। যবনের অবরোধ প্রথা গ্রহণ করিয়া পর্যন্ত ক্ষত্রিয় রমণীগণ এ শিক্ষা ত্যাগ করিয়াছেন।[১২]

নারীর স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল মধ্যযুগে। অবরোধ প্রথা বা অস্ত্রধারনের নিষেধাজ্ঞা আর্যনারীর সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল না। সমকালীন চিন্তায় এবং ইতিহাসচর্চার মধ্যেও এই ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। স্বর্ণকুমারীর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ঘোড়ায় চড়ে প্রকাশ্য রাজপথে বের হয়ে অভিলেখ সৃষ্টি করেছিলেন সে যুগে। পুরুষের পোষাক পরে শৈলবালার যে মনোভাব হয়েছিল, উনিশ শতকে নারী জাগৃতির পটভূমিকায় সেটাও আলোচ্য। ঠাকুর বাড়ির মহিলারা প্রকাশ্যে বাড়ির ছাদে উঠতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ এতে কোনো বাধা দিতেন না। পরবর্তী সময়ে অবলা বসুরা স্কুলে মেয়েদের ব্যায়াম, লাঠিখেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী এ ভাবনাকে প্রকাশ করেছিলেনপ্রভাবতীর উদ্দেশ্যে শৈলবালার উক্তির মধ্যে।

> পুরুষ সেজে নিজেকে আমার সত্যিই পুরুষ মনে হচ্ছে। যদি পথে কেউ অত্যাচার করতে আসে, তাহলে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব।[১৩]

আর্য নারীর বীরত্বের প্রতীক রাজপুত কন্যা পৃথ্বীরাজ মহিষী। বীরাঙ্গনা রাজমহিষী স্বামীকে বন্ধনমুক্ত করার

জন্য যুদ্ধে যাওয়াই স্থির মনে করেছিলেন। নারীর জীবন শুধু গৃহকেন্দ্রিক হতে পারে না। জাতীয় জীবনের সংকটে নারীরও ভূমিকা রয়েছে পৃথ্বীরাজ মহিষীর মধ্যে লেখিকার এই ভাবনাই লক্ষ করা যায়।

কিন্তু মহারাজ সম্রাট, আমি প্রজা হইয়া কখনই নিরপেক্ষ থাকিতে পারিব না ....[১৪]

বিদ্রোহ (১৮৯০) ও ফুলের মালা (১৮৯৫) উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যভাবনার ছায়া লক্ষিত হয়।

রাণী সেমন্তী উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট নারী চরিত্র। ঊনবিংশ শতকের নারীজাগরণ নারীর মনে যে আত্মজিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল সেমন্তী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অষ্টম শতকের বহুবিবাহ স্বীকৃত সমাজে রাজা নাগাদিত্যর দ্বিতীয় বিবাহ স্বীকার করে নেওয়াই রাণী সেমন্তীর কাছে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ভীলকন্যা সুহারের প্রতি রাজার আকর্ষণকে সে মেনে নিতে পারেনি। তার মনে আত্মদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। রাজাকে সে বলেছে —

তুমি এ বিষয়ে ভাব না বলিয়াই ও আমার ভাবিতে হয়। তুমি যে একজন স্ত্রীলোককে
কলঙ্কিত করিতেছ তাহা যদি ভাবিতে তাহা হইলে কি তোমার এরূপ মতি থাকিত?
তোমার মঙ্গল তুমি না দেখিলে আমি অবশ্যই দেখিব।[১৫]

কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চিরাচরিত সংস্কারে লালিত রাণীর কাছে স্বামীর সুখই প্রধান। আর সেজন্যই নাগাদিত্য — সুহারের বিবাহে রাণী কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি। নিজের সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে সুহারকে সাজিয়ে স্বামীর অধিকার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের কাছে নারীর প্রতিবাদের কোনো মান্যতা নেই। কিন্তু স্বামীর জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে সেমন্তীর নীরব প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

মহারাজ আমি ঈর্ষাবশতঃ তোমার সুখের পথে বাধা দিই নাই, নিজ হস্তে আপনার
সুখ তোমাকে দান করিতে আসিয়াছি। গ্রহণ কর।[১৬]

রাণীর এই উক্তির মধ্যে তার চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

সমকালীন সামাজিক সমস্যা সমূহ স্বর্ণকুমারীর লেখনীতে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বাংলার অসহায় মেয়েদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন লেখিকা। বাংলাদেশে অনেক মেয়েকেই নানা কারণে 'লগ্নভ্রষ্টা' হয়ে দুঃখের জীবন কাটাতে হত। উপন্যাসে আদিবাসী সমাজে পালিতা সুহারের বিয়ের আসরে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু স্বর্ণকুমারী সুহারের জীবনে একটি বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। শুধুমাত্র বিবাহই যে নারীজীবনের একমাত্র সার্থকতা নয় এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন লেখিকা। দেখা যায় যে, সুহার রাজা নাগাদিত্য ও রাণী সেমন্তীর পুত্র বাপ্পাদিত্যর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছে। বর্তমান যুগে মেয়েরা বিয়েকে আর সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। অনেক মেয়েই এককভাবে স্বাধীন জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। প্রয়োজন হলে দত্তক গ্রহণ করছে। স্বর্ণকুমারী সুহার চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিবাহের বাইরেও যে নারী নিজের জীবন নিজের মতো করে কাটাতে পারে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'ফুলের মালা' (১৮৯৫) উপন্যাসের সময়কাল চতুর্দশ শতক। উপন্যাসের নায়িকা শক্তিময়ীর মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর স্বাধীন সত্তার চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে নারীর প্রতিবাদী শক্তি ছিল। সে গণেশ দেবকে বিবাহিত দেখে বলেছিল —

> ভগবান, পৃথিবীতে তুমি পুরুষ ও নারীকে এতই অসমান করিয়া জন্ম দিয়াছ? একজন কাঁদিয়া মরিবে আর সেই অশ্রুজলে অন্যজনের হাসি ফুটিয়া উঠিবে?[১৭]

চতুর্দ্দশ শতকের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসে নারীর স্বাধীন চেতনার জাগরণ লেখিকা শক্তিময়ীর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকে রাজকুমার গণেশদেবের প্রতি ভালবাসা অন্যদিকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা এই দুইয়ের অনুভূতিতে শক্তি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। শক্তির বিভিন্ন ভাবানুভূতি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা তার চরিত্রের সজীবতা বজায় রেখেছে। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত শক্তিময়ীর আত্মমর্যাদা জ্ঞান প্রবল ছিল।

> যাহাকে ভালবাসিনা, যাহাকে হৃদয় দিতে পারি না কি করিয়া তাহার সহবাস করিব?[১৮]

'বিবাহ' শব্দটি যে একজন নারীর জন্য আত্মদান নয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক মিলনই সবচাইতে বড়ো সত্য, শক্তি একথা উপলব্ধি করেছে। কিন্তু পিতৃতন্ত্রে নারীর কণ্ঠস্বর কোনোদিন শোনা যায় না। সেজন্যই শেষপর্যন্ত শক্তি গায়সুদ্দিনকে বিবাহ করে পিতৃতান্ত্রিক পরিসরেই আত্মসমর্পণ করেছে।

তবে স্বর্ণকুমারীর অনেক উপন্যাসেই মানুষের মনুষ্যত্বের দিকটাকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন। সেজন্য দেখা যায় যে পার্থিব জগতের বাসনা ও লোভকে অতিক্রম করে নির্মোহ হয়ে শক্তি নিজের সমস্ত আনন্দ সুখকে বিসর্জন দিয়ে, আত্মদানের মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সমাজে কোনো আন্দোলন হয়নি। কারণ মুসলমান সমাজ হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিল। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী একজন মুসলমান রমণীর জীবনসমস্যাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সে সময় সাহিত্যিকেরা মুসলমান সমাজের সমস্যা সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না।

মুন্নার চরিত্রে ব্যক্তিত্বের কোনো বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। হিন্দুনারীর পতিভক্তির আদর্শই তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে। সাধারণ বাঙালি সমাজে নারীর নিজস্ব কোনো পরিসর থাকা তখন সম্ভব ছিল না। পতিই নারীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। পতি স্বর্গ, পতি ধর্ম এই বোধ তখন নারীর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মুন্নাও নিষ্ঠুর অমানবিক নির্মম স্বামীর পদতলে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছিল। তাঁর স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ হয়েছে নবাব খাঁ জাহান খাঁর পাঠানো বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মধ্যে।

আরেকটি জায়গায় মুন্নার মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনযুদ্ধে মুন্না দুর্বল হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি। দস্যু কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পর আত্মহত্যার কথা মনে জাগলেও সে ভেঙে পড়েনি।

> আত্মহত্যা করিব? মানুষ হইয়া, দুঃখকে পদানত করিতে পারিব না, দুঃখের পদতলে দলিত হইব? দুঃখ আমাকে ভয় করিবে না, আমি দুঃখের ভয়ে আত্মহত্যা করিব, মনুষ্যত্ব হত্যা করিব? কখনই না। ... চিরকাল দুঃখের ভ্রূকুটি সহিয়াছি, এখন দুঃখকে ভ্রূকুটি করিতে শিখিব।[১৯]

বহুবিবাহ, বিধবা সমস্যা কবলিত সমাজে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেক মেয়ে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজত। কিন্তু বেঁচে থাকার অধিকার সবার আছে। স্বর্ণকুমারী সমাজের অসহায় মেয়েদের আত্মহত্যাই মুক্তির একমাত্র পথ নয় একথা বোঝাতে চেয়েছেন। সেজন্য দেখা যায় মানব সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে মুন্না ও তার ভাই মসীন জীবনে শান্তি খুঁজে পেয়েছে।

> তাহাদের ন্যায় তাঁহাদের ধন, ঐশ্বর্য্যও দীনদুঃখী-দিগের শান্তির উপায় হইল, সেই ধনে কত অতিথি শালা, কত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই ধনে শত শত দরিদ্রের জন্য বৃত্তি স্থাপিত হইল, সেই ধনে হুগলীর ইমামবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইল। হুগলীর কলেজেও গভর্ণমেন্ট পরে মহম্মদ মসীনের সম্পত্তির টাকা হইতে স্থাপন করিয়াছেন। তাহার পর শতাধিক বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখনও হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে মাদ্রাসাগুলি তাঁহার দানের টাকা হইতে চলিতেছে, এখনো কত শত ছাত্র, কত অসহায় আতুর তাঁহার টাকায় প্রতিপালিত হইতেছে, আর এখনো কারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র হুগলীর ইমামবাড়ী ঊর্দ্ধমস্তকে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।[২০]

স্বর্ণকুমারী ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে মেয়েদের জীবন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন। সেজন্য উক্ত উপন্যাসটিতে পতিসর্বস্ব জীবনের বাইরেও যে জীবনের আরও পথ উন্মুক্ত রয়েছে সে কথাই লেখিকা বোঝাতে চেয়েছেন।

লিঙ্গ বিভাজন আজও সমাজের একটি বড়ো সমস্যা। 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯) উপন্যাসে কনকের জীবনের মধ্যে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ এবং পরিবারে মেয়েদের প্রতিটি পদক্ষেপ পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজের মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করতে চাওয়াটাও স্বীকৃতি পায় না সমাজের। কনকের জীবনের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে মেয়েদের জীবন পরিস্থিতিকে অবলোকন করেছেন লেখিকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রগতিশীলতার যে জোয়ার এসেছিল তারই টানে লেখাপড়া শিখেছিল কনক (ছিন্নমুকুল) এবং স্নেহলতা (স্নেহলতা বা পালিতা)। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপের অবিচারের বোঝা বইতে বইতে তারা জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

লেখিকা এই দুইটি উপন্যাসেই মেয়েদের জীবনে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কনক এবং স্নেহলতা যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হত তবে তাদের প্রাণ অকালে ফুরিয়ে যেত না।

কনকের স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে হিরণকুমারকে ভালবেসেও সে দাদা প্রমোদের অনিচ্ছার জন্য তাকে বিয়ে করতে পারেনি। কিন্তু প্রমোদের মনোনীত পাত্র যামিনীনাথকে বিবাহ করতেও সে স্বীকৃত হয়নি। দাদার কথার উত্তরে সে বলেছে —

> দাদা, অনিচ্ছায় বিবাহ করতে নেই, একি তোমার কাছেই শিক্ষা পাইনি।[২১]

ভাইয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে হিরণকুমারকে বিবাহ করতে কনক পারেনি। কিন্তু সে আত্মসুখ বিসর্জন দিলেও ভাইয়ের মনোনীত পাত্র যামিনীনাথকে বিবাহ করে আত্মবলি দেয়নি।

অনাথা আশ্রিতা বিধবা স্নেহলতার জীবন কাহিনির মধ্য দিয়ে স্বর্ণকুমারী সমাজের নির্দয় রূপটিকে তুলে ধরেছেন। তারই সঙ্গে মেয়েদের যে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা কত প্রয়োজন সেই দিকটির প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। বিধবার প্রেম ও বিধবার বিবাহ তৎকালীন সমাজে গ্রহণীয় ছিল না। কারণ মেয়েদের মানসিকতাও পিতৃতন্ত্র দ্বারাই আচ্ছন্ন ছিল। সেজন্যই স্নেহলতার মনেও প্রশ্ন জেগেছে একবার বিয়ে হলে আবার বিয়ে করা কিভাবে সম্ভব। স্নেহলতা চারুকে ভালবাসত ঠিক, কিন্তু সমাজ নির্দেশিত ধারণা থেকে সে সরে আসতে পারেনি। আমাদের সমাজে আজও সামাজিক শুভ কাজে বিধবাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়। স্নেহলতা সারাজীবন অন্যের আশ্রিত হয়ে থেকেছে। কিন্তু লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও সে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়নি। স্বর্ণকুমারী তাঁর 'সখিসমিতি'র ভাবনায় বিধবা ও কুমারী মেয়েদের স্বাবলম্বিতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসে স্নেহলতার জীবনের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে তিনি নারীসমাজকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন।

উপন্যাসে বিভিন্ন নারীচরিত্রে স্বর্ণকুমারী তীক্ষ্ণ নারীর দৃষ্টিতে সমাজের হৃদয় হীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জগৎবাবুর স্ত্রী, মোহনের জ্যাঠাইমা সেইসব নারী সমাজের প্রতিনিধি যারা পুরুষের চোখ দিয়ে জগৎকে দেখেন।

> নিজেদের জীবনের বঞ্চনা ক্ষোভকে অন্যের প্রতি ঔদার্যের মহানুভবতায় চালিত করার মত চারিত্রিক বলের অধিকারী এঁরা নন। জীবনের দুর্বিপাকে এই ধরনের কঠিন হৃদয়া নারীদের কাছে আশ্রিত হয়ে স্নেহলতার অনভিজ্ঞ সরল অবোধ কিশোরী হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।[২২]

স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বপ্নপূরণ হয়েছিল 'কাহাকে?' (১৮৯৮) উপন্যাসের মৃণালিনীর মধ্যে। উপন্যাসটি গতানুগতিক কাহিনির ধারার বাইরে এসে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অভিমুখী হয়েছে। 'কাহাকে?'-তে নায়িকা মণি বা মৃণালিনী আত্মকথনের মধ্য দিয়ে যে নতুন দাবি নিয়ে এল উনিশ শতকের ইতিহাসে তা ব্যতিক্রমী বলতেই হবে। উপন্যাসটিতে মণি তার ছেলেবেলা থেকে বিবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত অধ্যায়ে তার জীবনের ভালবাসার কাহিনি অকপটে ব্যাখ্যা করেছে।

> আসলে স্বর্ণকুমারী দেবী একটি শিক্ষিত নারীমন খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেছেন। ভাবনার জটগুলো ওলটপালট করে আবার নিভৃতে সাজিয়েছেন। এখানে মণির মনের আদলটাই লেখক রচনা করেছেন আরো এক শতাব্দী এগিয়ে থেকে।[২৩]

কোনো যৌক্তিকতা ও আবেগ মেনে নেয়নি মণি। সে বিচার করে নিতে চেয়েছে ভাবী স্বামীকে। লেখিকা নায়িকার বাচনভঙ্গিতে নারীবাদী চেতনার আভাস দিয়েছেন।

> মনের মধ্যে মন দিয়া অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম — না, তাহা ঠিক নহে, সর্বপ্রথম তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া যেমন হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার এই অনুরাগ-বাক্যে আজও কেমন যেন সহসা সুমধুর সঙ্গীত-সুরে একটা বিষম বেসুরো স্বর কানে বাজিল, অমৃতভান্ডে এক বিন্দু তীব্র বিষক্ষেপের ন্যায় সুখের মধ্যে প্রাণ যেন কেমন আকুল হইয়া উঠিল। আশার কোণে কোণে নৈরাশ্যের ঘন ছায়া জমাট বাঁধিল, — মনে হইতে লাগিল যেন, যাহা চাহিয়াছিলাম, এ তাহা নহে; যাহা

বুঝিয়াছিলাম, এ তাহা নহে।[২৪]

সময় ও সমাজের বিধিকে অস্বীকার করে মৃণালিনী নিজের মত ও ইচ্ছেকে প্রকাশ করেছে।

সে পুরুষ বিদ্বেষী নয় কিন্তু পুরুষের সাথে তার লিঙ্গগত বিরোধ প্রকাশ পেয়েছে। মণি বিবাহিত প্রেমকেই একমাত্র মনে করেনি, প্রেমের কথা বলতে গিয়ে জড়তা বা সংশয়ে আক্রান্ত হয়নি। মণি একবার নয় একাধিকবার একাধিক পুরুষকে ভালবেসেছে। প্রেম সম্পর্কে প্রথাগত ধারণাও সংস্কারকে ভেঙে মণি বেরিয়ে এসেছে।[২৫]

সময় থেকে অনেক এগিয়ে গেছে মণি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে সে পিতার পছন্দ করা পাত্রকেও বাতিল করে দিতে চেয়েছে। যদিও কাহিনির সমাপ্তিতে পিতার মনোনীত পাত্র ছোটু ও তার নিজের পছন্দের পুরুষ একজনই প্রমাণিত হয়েছিল।

এই উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী একটি পরিণত নারীমনকে চিরে চিরে দেখেন। ভালবাসাকে বিভিন্ন ছাঁচে ফেলে অবশেষে নিরাকার করে তোলেন। মণি তথা মৃণালিনীকে বিংশ শতাব্দীর ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত করে, নারীমনের চাহিদাকে, চিন্তাশীলতাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।[২৬]

'বিচিত্রা' (১৯২০) 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১) এবং 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫) ত্রয়ী উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবীর রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ হয়েছে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর চরিত্রের মধ্যে। স্বর্ণকুমারী চাইতেন দেশের মেয়েরাও স্বদেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করুক। নিজে মহিলা ডেলিগেটরূপে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসের নায়িকা জ্যোতির্ময়ী আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছে। জ্যোতির্ময়ীর মধ্যে স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবীকে খুঁজে পাওয়া যায়।

জ্যোতির্ময়ী চেয়েছে সারাজীবন অবিবাহিতা থেকে দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে। তাঁর ভালবাসার পুরুষ ডাক্তার শরৎকুমারও তার সাথে স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

... রাজকুমারীর সক্রিয় স্বাদেশিকতা দীক্ষাই এ উপন্যাসত্রয়ীর মূল চালিকা শক্তি।[২৭]

স্বর্ণকুমারী পুরুষ ও নারীর সমঅধিকার চাইতেন। সেজন্য এই উপন্যাস ত্রয়ীতে রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীকে দেশের তরুণ দলের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। শুধুমাত্র গৃহের অভ্যন্তরে নয় বাইরের কর্মজগতও যে মেয়েদের জন্য প্রসারিত এই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসটিতে।

স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক চরিত্রের আদল খুঁজে পাওয়া যায় উপন্যাস ত্রয়ীতে। হাসি ও কৃষ্ণলাল, জ্যোতির্ময়ী ও রাজা অতুলেশ্বরের ছায়ায় যেন স্বর্ণকুমারীর শৈশবকে খুঁজে পাওয়া যায়। কৃষ্ণলালের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছায়া লক্ষিত হয়।

স্বর্ণকুমারীর সমকালীন চারজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। আর অনুজ রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) তো ছিলেনই।

স্বর্ণকুমারী তাঁর পূর্বসুরী বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেই এগিয়ে গিয়েছিলেন উপন্যাস রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস জগতে প্রবেশ করেছিলেন তখনও নারীর মানবী পরিচয় গড়ে উঠেনি। পাশ্চাত্যে বিক্ষিপ্তভাবে নারী আন্দোলন সংঘটিত হলেও তখনো নারীবাদী ভাবনা দানা বেঁধে উঠেনি। এই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রেরও পুরুষাধিপত্য অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) প্রভৃতি উপন্যাসে নারীর মধ্যে স্বাধীন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েও দেখা যায় যে বঙ্কিম আবার পিতৃতন্ত্রের রক্ষণশীল পরিসরেই ফিরে গিয়েছেন।

স্বর্ণকুমারী বঙ্কিমযুগে বসে মোট আটটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি উপন্যাসেই তার স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ হয়েছে। উনিশ শতকে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার যে সংঘর্ষ চলছিল তার প্রভাব তৎকালীন সাহিত্যিকেরা অতিক্রম করতে পারেননি। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসেও দেখা যায় যে লেখিকা উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে স্বাধীন চেতনার উন্মেষ দেখিয়েও আবার পিতৃতান্ত্রিক পরিসরেই ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূর্যমুখীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) উপন্যাসের রাণী সেমন্তীর একটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও দুটি উপন্যাসেরই প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। বহুবিবাহ স্বীকৃত সমাজে সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু সূর্যমুখী তা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

> আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?[২৮]

'বিদ্রোহ' উপন্যাসে রাণী সেমন্তী রাজা নাগাদিত্যের সুহাবের প্রতি আকর্ষণকে মেনে নেননি। তার মনে আত্মদ্বন্দ্ব জেগেছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধানকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তার ছিল না। সেজন্য দেখা যায় যে রাণী নিজ হাতে সুহারকে সাজিয়ে এনে রাজার হাতে তুলে দিলেন।

> মহারাজ আমি ঈর্ষাবশতঃ তোমার সুখের পথে বাধা দিই নাই, নিজ হস্তে আপনার সুখ তোমাকে দান করিতে আসিয়াছি। গ্রহণ কর।[২৯]

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীকে বঙ্কিম পথে বের করেছিলেন। কিন্তু সমাজনীতিকে রক্ষা করার জন্য তিনি সূর্যমুখীকে আবার গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কারণ সমাজনীতিকে অতিক্রম করা বঙ্কিমের পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। সেমন্তী সুহারের সঙ্গে রাজার বিবাহ মেনে নিতে পারেননি।

> ... নিজ হস্তে আপনার সুখ তোমাকে দান করিতে আসিয়াছি।[৩০]

এই উক্তির মধ্যে সেমন্তী চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে। সূর্যমুখীর মত সেমন্তীকে পথে বের করেননি লেখিকা। সুহার নাগাদিত্যের বিবাহ আসরে বিদ্রোহী ভীলদের হাতে তাদের মৃত্যু হয়েছিল।

'ইন্দিরা' (১৮৭৩) ও 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র লেখন রীতিতে একটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী 'কাহাকে?' (১৮৯৮) উপন্যাসে চিরাচরিত কাহিনি ধারা থেকে বের হয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। 'রজনী' ও 'ইন্দিরা' উপন্যাসে বঙ্কিম যে আত্মকথমন রীতিতে কাহিনি বয়ন করেছিলেন স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে?' উপন্যাসেও ঐ একই রীতিতে রচিত হলেও 'কাহাকে?' সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের উপন্যাস। বঙ্কিমের

উপন্যাসের ঘটনা বহুলতা স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসটিতে নেই। উপন্যাসটিতে লেখিকা মনস্তত্ত্বের মধ্য দিয়ে নায়িকার আত্মউন্মোচন ঘটিয়েছেন।

> বহিঃজগত অপেক্ষা অন্তঃজগতকে বিশ্লেষণের দিকে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি অধিক। এই ক্ষেত্রে বিষয়ের চেয়ে চরিত্রের প্রাধান্য বেশি। গুরুত্বও বেশি, সূক্ষ্মতার পরিমাণও যথেষ্ট, মনের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ কখনও বা দুরূহও বটে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস এই সূক্ষ্ম বিচিত্রধর্মীতার পটচিত্র অঙ্কনে সক্ষম। 'কাহাকে' উপন্যাসকে বিশ্লেষণের মধ্যে একই রীতি অনুসরণ লক্ষণীয়।[৩১]

উনিশ শতকে বসে আধুনিক শিক্ষিতা অভিজাত সমাজের মেয়ে মৃণালিনীর মধ্যে নিজের অন্তর্রহস্য উন্মোচন সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। উনিশ শতকের উপন্যাস সাহিত্যে 'কাহাকে?' একটি ব্যতিক্রমী রচনা হিসেবে স্বীকৃত।

রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' (১৮৮৬) 'সমাজ' (১৮৯৪) উপন্যাস দুইটিতে বিধবা বিবাহ (সংসার) ও অসবর্ণ বিবাহ (সমাজ) দেখিয়েছেন। বই দুটিতে লেখকের সমাজ-সংস্কারে লক্ষ স্পষ্ট। স্বর্ণকুমারীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। উপন্যাসে রাজা নাগাদিত্য গণপতিকে আদিবাসি কন্যা সুহারকে বিবাহ করার জন্য নতুন নিয়ম প্রবর্তন করার আদেশ দিয়েছিলেন।

> মনু যে বিধি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা এখন আর ধর্ম বিবাহ বলিয়া চলিত নাই, আমি সেই বিধিই পুনঃ প্রচলন করিতে চাই —[৩২]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করতেন না। স্বর্ণকুমারীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল ত্রিপুরার রাজপরিবারের কন্যাকে বিবাহ করলে মহর্ষির নির্দেশে ঠাকুর পরিবারের কেউ এই বিয়েতে অংশ নেননি।

'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা আছে। উপন্যাসটিতে সমকালীন সমাজের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

> যদি বিধবা মাত্রেই পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করে আনন্দলাভ করতে পারেন তা হলে ত আর এ সম্বন্ধে কারো কিছু বলবার নেই। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত যে মিলন আকাঙ্ক্ষা — তা অতিক্রম করে জীবনের গতিকে অন্য পথে নিয়ে যাওয়া সকলের পক্ষে সহজ নয়। কারো কারো পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আর বস্তুতঃ ইহা অপবিত্র - অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাও নয়; কেননা এই মিলনেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ।[৩৩]

স্বর্ণকুমারী দেবী 'বিধবা বিবাহ ও হিন্দু পত্রিকা' প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের সমর্থন করেছিলেন।

> আর যে বিষয়েই সমাজ উন্নতিপথে অগ্রসর হউক না, রমণীগণের মনুষ্যোচিত সুখ, শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ বিধানে তাহার স্বার্থখড়্গ এখনো বজ্ররূপে উদ্যত।[৩৪]

'স্নেহলতা বা পালিতা' (১৮৯২, ১৮৯৩) উপন্যাসে লেখিকা বিধবার প্রেম ও বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে সমাজকে সচেতন করে দিয়েছেন।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-১৮৯১) লেখা 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) উপন্যাসটি সে সময়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। তার এক বছর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতকে বাঙালির জীবনে ও মননে যে উন্মাদনা এসেছিল, প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল উক্ত উপন্যাসে তার কোনো ছবি পাওয়া যায় না। তবে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের নায়িকা স্বর্ণলতার ব্যক্তিত্ব এখানে যে সে তার ঠাকুমার গুরুদেব শশাঙ্কশেখরের মনোনীত পাত্রকে বিবাহ করতে রাজি হয়নি। তাকে ঘরে বন্ধ রাখা হয়েছে কিন্তু মাথা নতকরেননি সে। তার পছন্দের পাত্র গোপালকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে তাকে উদ্ধার করার জন্য এবং শেষে শশাঙ্কর গৃহে আগুন লাগার সুযোগে সে পালিয়েছে। যে সময়ের কথা তারকনাথ লিখেছেন সেই সময় স্বর্ণলতার এই সাহস ও প্রতিবাদ বিস্ময়কর।

তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) লেখার চার বছর পর স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন তাঁর প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯)। উপন্যাসটিতে লিঙ্গ বিভাজন এবং মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখিকা। স্বর্ণকুমারীর প্রত্যেকটি উপন্যাসেই সমকালীন সময়ের কথা উঠে এসেছে। স্ত্রী শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বিধবা সমস্যা, স্বদেশচেতনা, প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব, মনস্তত্ত্ব সহ সমকালীন সমাজের ঘটনাবলী গুরুত্ব পেয়েছে তার উপন্যাসে। স্বর্ণকুমারীর ত্রয়ী উপন্যাস বিচিত্রা (১৯২০), স্বপ্নবাণী (১৯২১) এবং মিলন রাত্রি (১৯২৫) রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রযুগে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি বঙ্কিম যুগেই রচিত হয়েছিল। ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছিলেন —

> ... তিনিই একমাত্র ঔপন্যাসিক যার মধ্য দিয়ে আমরা একযুগ থেকে অন্য যুগে পদার্পণ করি।[৩৫]

স্বপ্নবাণী (১৯২১) উপন্যাস পাঠ করতে করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসের কথা মনে পড়ে।

> 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাস পড়তে পড়তে বারবার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কথা মনে পড়বেই। বঙ্গবিভাগ, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন। এই আন্দোলনের হিংসা ও বলপ্রয়োগ সম্পর্কে মতবিরোধ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আগুন-ঝরানো ভাষণ, রাখি-উৎসব, বিদেশি দ্রব্য বর্জনের সংকল্প উঠে এসেছে। স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগঠিত সন্ত্রাসবাদের পথে যে যুবকদল অগ্রসর হয়েছে, এই উপন্যাসে এসেছে সেই প্রসঙ্গ। লেখিকা তাকে সমর্থন করতে পারেননি।[৩৬]

স্বদেশী আন্দোলনে বলপ্রয়োগ হিংসা, ডাকাতি, হত্যা — এসবের কি প্রয়োজন? এই প্রশ্ন জেগেছে 'ঘরে বাইরের' নায়ক নিখিলেশের মনে — এই প্রশ্নই আবার দেখা দেয় ত্রয়ী উপন্যাসের নায়িকা জ্যোতির্ময়ীর মনেও।

স্বর্ণকুমারী তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে দেশসেবার ক্ষেত্রে সহিংস ও অহিংস দুটি পথ দেখিয়েছেন — যেমন দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে। 'ত্রয়ী' উপন্যাস (বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী ও মিলনরাত্রি) ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস দুটির মধ্যে এখানেই মিল; যদিও কাহিনিরূপ ও চরিত্রচিত্রণে দুজনে ভিন্নপথগামী।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ভট্টাচার্য তপোধীর, আখ্যানের সাতকাহন, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনিপুর - ৭২১১০১, পৃষ্ঠা ৯।

২. ভট্টাচার্য তপোধীর, আখ্যানের স্বরান্তর, দিবারাত্রির কাব্য, ২৯/৩ - শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১২, পৃষ্ঠা ১৩।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা ১৩।

৪. ভট্টাচার্য তপোধীর, আখ্যানের সাতকাহন, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনিপুর - ৭২১১০১, পৃষ্ঠা ১৩।

৫. ভট্টাচার্য তপোধীর, আখ্যানের স্বরান্তর, দিবারাত্রির কাব্য, ২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১২, পৃষ্ঠা ১৮।

৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৬।

৭. গুপ্ত ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, ৬৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা ১৯৬।

৮. ভট্টাচার্য তপোধীর, উপন্যাসের ভিন্নপাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ১৩।

৯. ঘোষ পূর্বাণী (সম্পাঃ) পুরবৈয়াঁ, ৯০ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা ৬৮।

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ৬২।

১১. আচার্য অরূপ (সম্পাঃ), 'একান্তর' ১৮ বর্ষ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ২২।

১২. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (সম্পাঃ), স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৪৮।

১৩. তদেব ১, পৃষ্ঠা ১৪৮।

১৪. তদেব ১, পৃষ্ঠা ১৮০।

১৫. তদেব ১, পৃষ্ঠা ৫২৮।

১৬. তদেব ১, পৃষ্ঠা ৫৩৮।

১৭. তদেব ২, পৃষ্ঠা ৭৪৯।

১৮. তদেব ২, পৃষ্ঠা ৭৮৮।

১৯. তদেব ১, পৃষ্ঠা ৪১৬।

২০. তদেব ১, পৃষ্ঠা ৪৩১।

২১. মুখোপাধ্যায় বাসন্তী, স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ১২২।

২২. চট্টোপাধ্যায় মীনা, স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুভাব, কলকাতা - ৭০০০২৬, পৃষ্ঠা ১২।

২৩. আচার্য অরূপ (সম্পাঃ), একান্তর ১৮ বর্ষ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১০৫।

২৪. দেবী স্বর্ণকুমারী, কাহাকে? দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৩০।

২৫. গিরি সত্যবতী মজুমদার সমরেশ (সম্পাঃ), রত্নাবলী, কলকাতা - ৯, পৃঃ ১০৭৬।

২৬. আচার্য অরূপ (সম্পাঃ), একান্তর ১৮ বর্ষ, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১০৬।

২৭. ঘোষ সুদক্ষিণা, স্বর্ণকুমারী দেবী, সাহিত্য অকাদেমি, ৩৫ ফিরোজ শাহরোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১, পৃষ্ঠা ৪৮।

২৮. বাগল যোগেশচন্দ্র (সম্পাঃ) বঙ্কিম রচনাবলী। প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা - ৯, পৃষ্ঠা ১৯৩।

২৯. মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার (সম্পাঃ) স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫৩৮।

৩০. তদেব, ৫৩৮।

৩১. ঘোষ পূর্বাণী (সম্পাঃ) পূরবৈয়াঁ, ৯০ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা ৬৪।

৩২. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (সম্পাঃ) স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫৩৫।

৩৩. তদেব ২, পৃষ্ঠা ৬৬৮।

৩৪. ঘোষ পূর্বাণী (সম্পাঃ), পুরবৈয়াঁ, ৯০ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা ৬৪।

৩৫. গুপ্ত ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৯৭।

৩৬. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (সম্পাঃ), স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ৫১।